HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৮ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০১০

আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

পাবনায় কলেরার প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ১২

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর সময় ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে ঢাকার মিরপুরের অধিবাসীদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ: খানা পর্যায়ে অসুস্থতা-সংক্রান্ত ব্যয়ের ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষা

পৃষ্ঠা ১৯

সার্ভিলেন্স আপডেট

চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে পরিবর্তন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালের জুলাই মাসে তিন বছরের জন্য ‘চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প’ চালু করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো মহিলাদের, বিশেষ করে প্রজননক্ষম মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার বাড়ানো এবং সেবার মান ও সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন করা। এ-লক্ষে প্রকল্প এলাকার বর্তমান সেবাদান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবার মান উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্প শুরুর আগে (বেজলাইন) করা সমীক্ষার ফলাফলের সাথে প্রকল্প শেষের (এন্ডলাইন) সমীক্ষার ফলাফলের তুলনায় দেখা যায় যে, বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে নির্ধারিত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হলে এর ব্যবহারও বেড়ে যায়।

২০০৭ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিলো ৯৬৬ জন এবং মোট জনসংখ্যা ছিলো ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ (১)। বাংলাদেশের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হলো প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রজননহার (রিপ্লেসমেন্ট লেভেল ফার্টিলিটি) গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা যেখানে প্রতি মহিলার গড়ে ২.১ জন সন্তান থাকবে যা পরবর্তী সময়ে তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে প্রতিস্থাপন করবে। এ-লক্ষে পৌঁছুতে হলে স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা অবশ্যই

icddr,b

KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

বাড়াতে হবে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিসমূহ ছিলো সরবরাহভিত্তিক। তাদের লক্ষ্য ছিলো জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা। ১৯৮০-র দশকে এই কৌশল উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা অর্জন করে এবং ১৯৯০-এর মাঝামাঝি এসে প্রজননহার দ্রুত কমে যাওয়া পর্যন্ত এ-সফলতার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে (২)। তবে ১৯৯৮ থেকে প্রজননহার খুব ধীরে কমছে (২)। প্রজননহারের স্থির অবস্থা অথবা এ-হার খুব ধীরে কমা-সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও বাংলাদেশে প্রজনন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আরো সমস্যা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব পদ্ধতি বর্তমানে আছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির গ্রহণযোগ্যতা কম। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে সেখানে মহিলাদের মধ্যে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার হার ৪৩% (৩)। দীর্ঘদিন ধরে মোট প্রজননহারের এই স্থির অবস্থা দেশের সরবরাহভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ২০০৫ সালের জুলাই মাসে তিন বছরের জন্য 'চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প' চালু করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চারটি ওয়ার্ডে এবং দুটি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। পপুলেশন কাউন্সিল; রিসার্চ, ট্রেনিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল; জন স্নো ইন্টারন্যাশনাল এবং আইসিডিডিআর,বি এই চারটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছিলো।

চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের (ডিবিআরএইচসিপি) অধীনে বর্তমান সরকারি সেবা-প্রদানকারীদেরকে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আচরণগত পরিবর্তন-সংক্রান্ত যোগাযোগ উপকরণ তৈরি করা হয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবহার বাড়ানো এবং তাদের ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করার জন্য ওই এলাকা থেকে কিছু স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ প্রমোটার) নিয়োগ করা হয়। এটি প্রত্যাশা ছিলো, প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সেবাপ্রদান, ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান, তথ্য সংরক্ষণ, প্রতিবেদন পেশ এবং উপকরণ সংগ্রহ (লজিস্টিক) ও সরবরাহসহ পুরো সেবাপ্রদান ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

আইসিডিডিআর,বি তিনটি এলাকার খানাসমূহে বেজলাইন এবং এন্ডলাইন সমীক্ষা পরিচালনা করে। এগুলোর একটি হলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে চারটি বস্তি যেগুলোর জনসংখ্যা ১৪১,৯১২ জন, একটি দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত একটি উপজেলা যার লোকসংখ্যা ৩২৩,৩৫৭ জন এবং অন্যটি দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত আরেকটি উপজেলা যার লোকসংখ্যা ২৬০,৯৮৩ জন। প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে ১০-৪৯ বছর-বয়সী বিবাহিত মহিলা, তাদের স্বামী এবং ১৩-১৯ বছর-বয়সী কিশোরী মেয়েদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেজলাইন সমীক্ষায় ১৯,৬৭১ জন মহিলা, ২,৪৩৩ জন স্বামী এবং ৩,১৯৬ জন কিশোরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না তা জানার জন্য এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র ১৯,৬৭১ জন মহিলা যারা বেজলাইনে অংশ নেয় এবং ১৯,৬৩৭ জন মহিলা যারা এন্ডলাইনে অংশ নেয় তাদের দেওয়া তথ্যের তুলনা করা হয়েছে।

আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণায় নিম্নোক্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। শহরের

তিনটি বস্তির সবগুলোতেই সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। বেজলাইনে এ-হার ছিলো ৫৯% এবং এন্ডলাইনে ৬৫%। ঢাকা এবং নবীগঞ্জে বেজলাইনের তুলনায় এন্ডলাইনে যেকোনো আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (ঢাকায় বেজলাইনে ৫১% থেকে এন্ডলাইনে ৫৮% এবং নবীগঞ্জে বেজলাইনে ২০% থেকে এন্ডলাইনে ৩০%)। তবে রায়পুরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হারে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে (বেজলাইনে ৪৩% থেকে এন্ডলাইনে ৪৪%)। সব এলাকার মহিলাদের মধ্যে বেজলাইনের তুলনায় এন্ডলাইনে ইনজেকশন এবং খাবার বড়ি নেওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা গেছে। এছাড়া সব এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য খাওয়ার বড়ি ব্যবহারের হার ছিলো সর্বাধিক (সারণি ১)।

সারণি ১: তিনটি প্রকল্প এলাকায় প্রজননক্ষম মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাবহার

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	ঢাকা (%)		রায়পুর (%)		নবীগঞ্জ (%)		মোট (%)	
	বেজলাইন (সংখ্যা= ৫,৪৭৭)	এন্ডলাইন (সংখ্যা =৫,৬৭০)	বেজলাইন (সংখ্যা =৬,৪৩৩)	এন্ডলাইন (সংখ্যা =৬,২১১)	বেজলাইন (সংখ্যা =৬,২৮৮)	এন্ডলাইন (সংখ্যা =৬,৪১৯)	বেজলাইন	এন্ডলাইন
সকল পদ্ধতি	৫৮.৭	৬৪.৯*	৪৯.৯	৫০.২	২২.৩	৩৩.৭*	৪৩.০	৪৮.৯
যেকোনো আধুনিক পদ্ধতি	৫১.১	৫৮.৭*	৪৩.৩	৪৪.৫	১৯.৭	৩০.১*	৩৭.০	৪৩.৯
মহিলা বন্ধ্যাকরণ	০.৫	৩.৪	০.২	২.৪	০.১	২.৭	০.২	২.৮
পুরুষ বন্ধ্যাকরণ	০.১	০.৯	০.০১	০.৩	০.০১	১.০	০.০	০.৭
খাবার বড়ি	৩৩.৯	২৯.৩	২৮.৬	২২.৩	১৪.৪	১৮.৪	২৫.৩	২৩.১
আইইউডি	০.৭	০.৫	১.৩	১.২	০.৬	০.৬	০.৯	০.৮
ইনজেকশন	৯.৪	১৭.৪*	১০.৬	১৫.১*	২.৪	৪.২*	৭.৪	১২.০
ইমপ্লান্ট	১.৮	১.৭	০.৭	১.০	১.২	১.৪	১.২	১.৪
কনডম	৪.৭	৫.৫	১.৯	২.১	১.০	১.৭	২.৫	৩.০
যেকোনো সনাতন পদ্ধতি	৭.৬	৬.২	৬.৬	৫.৭	২.৬	৩.৬	৫.৬	৫.০
বিরত থাকা	৫.২	৩.৬	৪.০	৩.২	১.৮	২.৩	৩.৬	৩.০
আজল	২.০	২.২	১.৭	১.৮	০.৫	১.০	১.৪	১.৬
আয়ুর্বেদিক	০.৪	০.৪	০.৯	০.৭	০.৩	০.৩	০.৬	০.৪

*বেজলাইন এবং এন্ডলাইনের মধ্যে পরিসংখ্যানগত পার্থক্য উল্লেখযোগ্য (পি.<.০০১)

গ্রামীণ এলাকায় বেজলাইনের তুলনায় এন্ডলাইনে বেশিসংখ্যক মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে সরকারি সংস্থা থেকে। রায়পুরে এ-হার বেজলাইনে ৩৭% থেকে এন্ডলাইনে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় (পি<.০০১), তেমনিভাবে নবীগঞ্জে বেজলাইনে এ-হার ছিলো ৪১% যা এন্ডলাইনের সময় ৫০% পর্যন্ত হয় (পি<.০০১)। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে বেজলাইনের তুলনায় এন্ডলাইনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেওয়ার হার বেশি দেখা গেছে বেসরকারি সংস্থা থেকে (বেজলাইনে ২০% এবং এন্ডলাইনে ৩৬%) (পি<.০০১) (চিত্র ১)।

নবীগঞ্জে বেজলাইন থেকে এন্ডলাইনে মহিলাদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় সেবা নেওয়ার হার বেশি দেখা গেছে (বেজলাইনে ৪৩% এবং এন্ডলাইনে ৫৭%)। একইভাবে রায়পুরেও বেজলাইনের তুলনায়

এন্ডলাইনে মহিলাদের মধ্যে তাঁদের শেষ গর্ভকালীন সময়ে সেবা নেওয়ার হার বেশি ছিলো (বেজ লাইনে ৭৮% এবং এন্ডলাইনে ৮১%)। এ-ধরনের পরিবর্তন অবশ্য শহরাঞ্চলের বস্তিতে দেখা যায় নি। সব এলাকায়ই বেজলাইনের তুলনায় এন্ডলাইনে প্রসব-পরবর্তী সেবা নেওয়ার হারও বেশি দেখা গেছে (সারণি ২)।

চিত্র ১: পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত ব্যবহৃত উপকরণের সর্বশেষ উৎস: বেজলাইন এবং এন্ডলাইনে প্রাপ্ত তথ্য

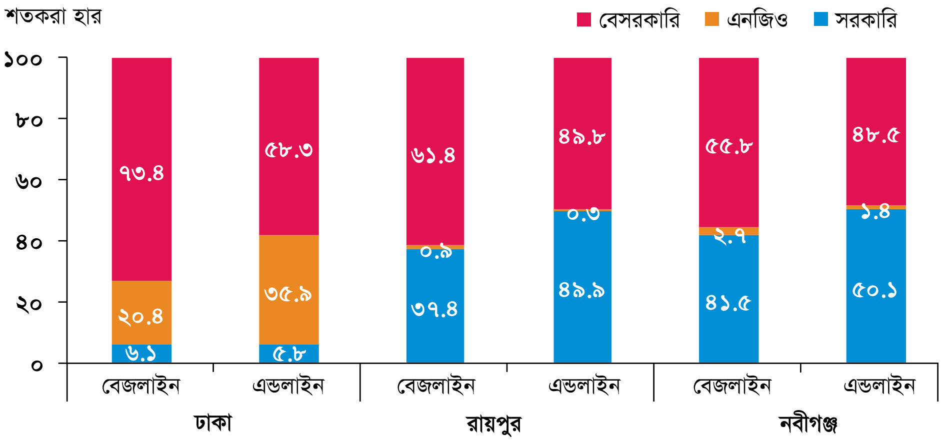

সারণি ২: প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন এলাকায় গর্ভকালীণ এবং প্রসব-পরবর্তী সেবার অবস্থা

স্বাস্থ্যসেবা	ঢাকা (%)		রায়পুর (%)		নবীগঞ্জ (%)	
	বেজলাইন (সংখ্যা=৫,৪৭৭)	এন্ডলাইন (সংখ্যা=৫,৬৭০)	বেজলাইন (সংখ্যা=৬,৪৩৩)	এন্ডলাইন (সংখ্যা=৬,২১১)	বেজলাইন (সংখ্যা=৬,২৮৮)	এন্ডলাইন (সংখ্যা=৬,৪১৯)
গর্ভকালীন সেবা	৮২.৫	৮০.০	৭৭.৯	৮০.৬*	৪৩.৯	৫৭.১*
প্রসব-পরবর্তী সেবা	৩৭.১	৮৯.৮*	৩৯.৭	৮৯.০	৩৩.৭	৮৭.৩*

*বেজলাইন এবং এন্ডলাইনের মধ্যে কার পরিবর্তন পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য (পি.<.০০১)

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

অর্থানুকূল্য: কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)। প্রকল্প বাস্তবায়নে আরটিএম ইন্টারন্যশনাল এবং পপুলেশন কাউন্সিলের অবদানের কথা আইসিডিডিআর,বি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

মন্তব্য

চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিলো পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারীদের মতামত এবং সরকারি সংস্থা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নেওয়া এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-সংক্রান্ত পরিবর্তন মূল্যায়ন করা। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম এলাকায় নির্ধারিত স্বাস্থ্যসেবার ওপর ভাল প্রভাব

ফেলেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার এবং গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণের হার বেড়েছে।

তিনটি প্রকল্প এলাকার দুটিতে প্রজননক্ষম মহিলাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধির হার পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো উৎসাহব্যাঞ্জক ব্যাপার হচ্ছে, ইনজেকশন পদ্ধতি (যা প্রায়স্থায়ী একটি পদ্ধতি) নেওয়ার হার তিনটি এলাকার সবগুলোতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তুলনামূলকভাবে ভালো একটি 'মিশ্রণ পদ্ধতি' যা ভবিষ্যতে প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রজননহার অর্জনে সাহায্য করতে পারে। প্রসব-পরবর্তী সেবাগ্রহণকারী মায়েদের সংখ্যা তিনটি এলাকার সবগুলোতেই বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকসংখ্যক মায়েদেরকে প্রসব-পরবর্তী জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং দুটি সন্তান জন্মদানের মধ্যেকার বিরতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতই জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলারা পরবর্তী গর্ভধারণে দেরী করতে সমর্থ হতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় যেহেতু কোনো নিয়ন্ত্রিত (কন্ট্রোল) এলাকা ছিলো না এবং শুধুমাত্র গবেষণার পূর্বের এবং পরের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উল্লিখিত উন্নতি অধিকতর বড় কোনো সার্বজনীন প্রবণতার অংশও হতে পারে; তবে বিগত দশকের প্রজননহারের স্থির অবস্থা সে সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়।

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খরচের হিসাব নেওয়া হয়েছে যা ডিবিআরএইচসিপি-এর পরবর্তী কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করবে। গবেষণায় এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি সংস্থার বিনিয়োগ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব দেশের অন্যান্য এলাকায় ডিবিআরএইচসিপি-এর কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ রাখতে পারে।

চাহিদাভিত্তিক, কার্যকর এবং জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সঠিক কলা-কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এ-গবেষণার ফলাফলসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করতে না পারলে বাংলাদেশে অদুর ভবিষ্যতে প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রজননহার অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের যেসব স্থানে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মান খারাপ সেসব স্থানে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃষ্টিশীল প্রকল্পসমূহের পদ্ধতিগত মূল্যায়ন অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

References

1. Bangladesh Bureau of Statistics. Statistical pocket book of Bangladesh 2008. Dhaka: Planning Division, Ministry of Planning, 2008. 816 p.
2. National Institute of Population and Training. Bangladesh demographic and health survey 2007. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2009. 346 p.
3. Khan MA. Factors associated with oral contraceptive discontinuation in rural Bangladesh. *Health Policy Plan* 2003;18:101-8.

পাবনায় কলেরার প্রাদুর্ভাব

২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বি-র একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল পাবনা জেলায় ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধানে তাঁরা জানতে পারেন যে, অক্টোবর মাসের প্রথম দুসপ্তাহের মধ্যে পাবনা জেলা হাসপাতালে মোট ৭৫৩ জন ডায়রিয়া রোগী ভর্তি হয় এবং তাদের মধ্যে দুজন মারা যায়। প্রাদুর্ভাবটি পাবনা পৌরসভা এবং সদর উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ে। রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, প্রাদুর্ভাবটি ঘটেছিলো *ভিবরিও কলেরির* কারণে। ভারী বৃষ্টিপাতের পরেই হঠাৎ করে এ-ধরনের রোগী বেড়ে যাওয়া, কোনো একটি বিশেষ কারণ ছাড়াই চারিদিকে ব্যাপকভাবে রোগীর সন্ধান পাওয়া এবং প্রাদুর্ভাব-কবলিত এলাকায় ট্যাপ ও নলকূপের পানিতে কলিফর্ম পাওয়া থেকে বোঝা যায় যে, প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণটি ছিলো দূষিত পানি। অতএব, এ-ধরনের ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে অনতিবিলম্বে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে বাড়িতে পানি ফুটিয়ে অথবা ক্লোরিন বড়ির মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে পান করা-সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানো উচিত। পৌরসভা থেকে সরবরাহকৃত পানি ক্লোরিন প্রয়োগের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

বাংলাদেশে সব বয়সের মানুষের মৃত্যুর প্রধান পাঁচটি কারণের মধ্যে ডায়রিয়া একটি, যার ফলে বছরে ৬৮,০০০ মানুষ মারা যায় (১)। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০০৯ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালে যেসব কারণে সরকারি হাসপাতালসমূহে রোগী ভর্তি হয় তার প্রধান কারণ ছিলো ডায়রিয়া (১৫%) (২)। বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৭-এর তথ্য সংগ্রহ করার পূর্ববর্তী দুসপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের পাঁচ বছরের কম-বয়সী ১০% শিশু অন্তত একবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলো বলে জানা যায় (৩)।

২০০৯ সালের ১৩ অক্টোবর একটি দৈনিক পত্রিকা পাবনা জেলার ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাবের খবর প্রকাশ করে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বি-র একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল রোগের কারণ, ছড়ানোর উৎস সনাক্তকরণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১৪ অক্টোবর পাবনা গমন করে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধানী দলটি পাবনা জেলার সিভিল সার্জনের অফিসে যোগাযোগ করে। ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন জানান যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে পাবনা জেলায় ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। অনুসন্ধানী দলটি পাবনা জেলায় গত পাঁচ বছরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মাসিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছ থেকে ১ অক্টোবর হতে কমিউনিটি পর্যায়ে সনাক্তকৃত রোগীদের সংখ্যা এবং পাবনা জেলার বাকী আটটি উপজেলার মোট রোগীদের সংখ্যাও তাঁরা সংগ্রহ করেন।

পাবনা জেলার গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের তুলনায় এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডায়রিয়া-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি ছিলো বলে জানা যায়, যদিও গত দুবছরে সারাবছর জুড়েই ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায় (চিত্র ১)। তবে ২০০৯ সলের ২২-২৪ সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিপাতের পর হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগী ভর্তির সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ৫-৯ অক্টোবরের বৃষ্টিপাতের পর ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা পুনরায় দ্রুত বেড়ে যায় (চিত্র ২)। ১ থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৭৫৩ জন ডায়রিয়া-আক্রান্ত রোগী পাবনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়।

পাবনা সদর উপজেলার কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ৭ অক্টোবর থেকে সেখানেও ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৩)। প্রাথমিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানী দল আক্রান্ত রোগীর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তা হলো, ‘পাবনা জেলায় বসবাসরত কোনো ব্যক্তি যে ১ অক্টোবর ২০০৯-এ বা তার পরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়’।

চিত্র ১: পাবনা জেলায় ডায়রিয়ার প্রবণতা (১ জানুয়ারি ২০০৫-১৪ অক্টোবর ২০০৯)

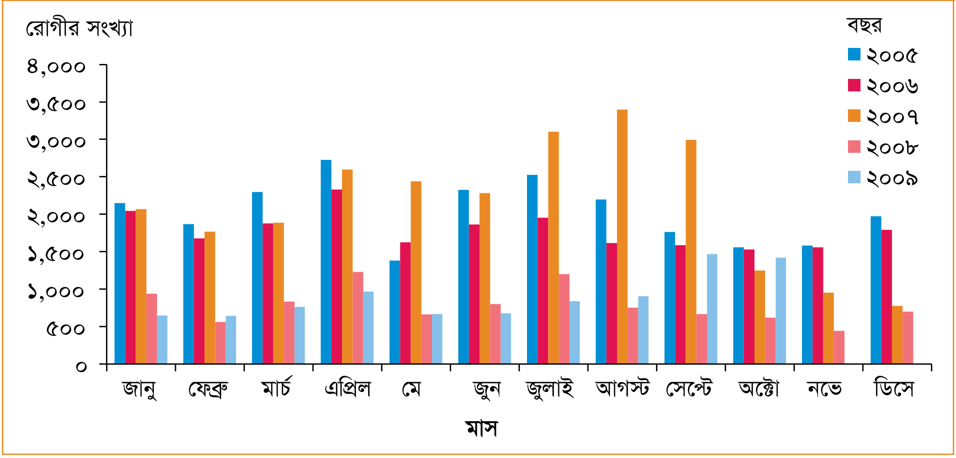

চিত্র ২: পাবনা জেলা হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগী ভর্তি এবং দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৯

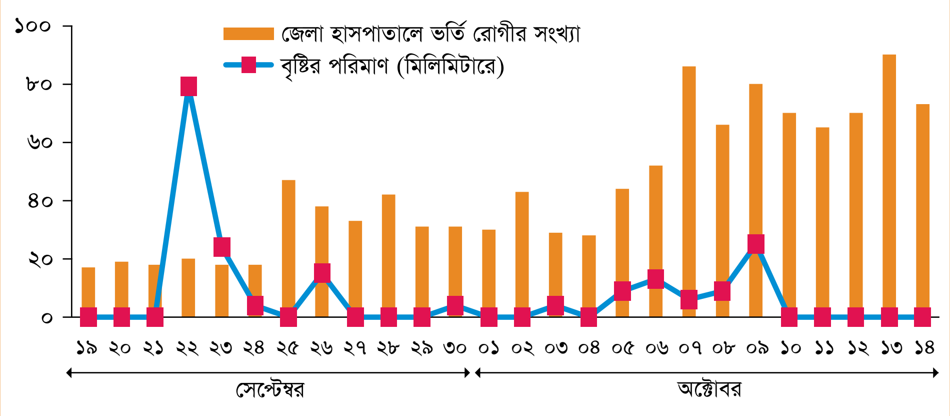

চিত্র ৩: কমিউনিটি পর্যায়ের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী রোগীর সংখ্যা (০১ অক্টোবর ২০০৯ থেকে)

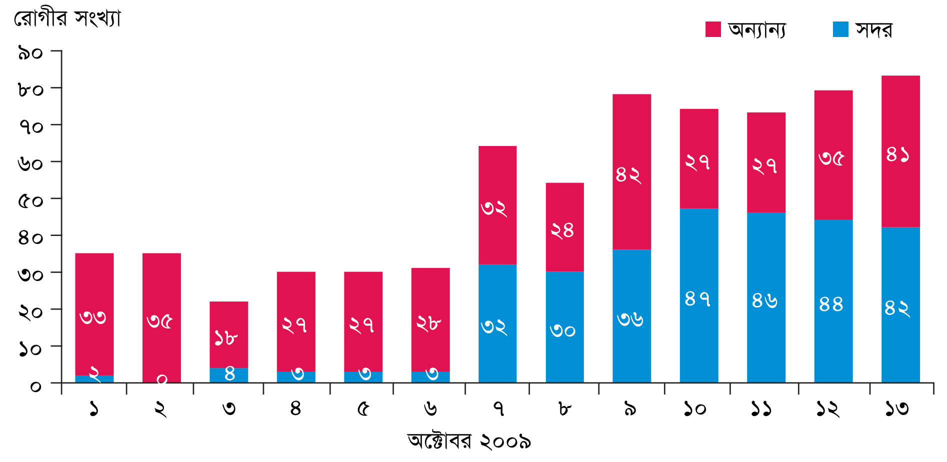

পাবনা জেলা হাসপাতালের ভর্তির রেকর্ড থেকে অনুসন্ধানী দল ২৫১ জন রোগীর জনমিতিক তথ্য সংগ্রহ করে (সারণি ১)। এসব রোগীর মধ্যে ৫২% ছিলো পুরুষ। আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি ছিলো ১৫-২৫ (৩০%) এবং ২৫-৩৫ (১৮%) বছর-বয়সীদের মধ্যে। দুশ একান্ন জন রোগীর মধ্যে ১১৫ জন (৪৬%) পাবনা সদর উপজেলায়, ৯৮ জন (৩৯%) পাবনা পৌরসভায় এবং ১৪ জন (৬%) আটঘরিয়া উপজেলায় বসবাস করতো। পাবনা পৌরসভার চারিদিকে অবস্থিত পাবনা সদর উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নেই ডায়রিয়া রোগী ছিলো, তবে সবচেয়ে বেশি ছিলো দোগাছি (২৬%) এবং হেমায়েতপুর (১৬%) ইউনিয়নে, যে দুটি ইউনিয়ন পাবনা পৌরসভার সবচেয়ে কাছে অবস্থিত। পাবনা পৌরসভার সব এলাকাতেও রোগী ছিলো এবং সবচেয়ে বেশি ছিলো শালগারিয়া (১৮%) এবং রাধানগর (১২%) এলাকায়।

সারণি ১: রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য (সংখ্যা=২৫১)

জনমিতি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা (%)
লিংগ	
পুরুষ	১৩১ (৫২)
মহিলা	১২০ (৪৮)
বছর-ভিত্তিক বয়সের বিন্যাস	
০-৫	২৯ (১২)
৫-১৫	২৪ (১০)
১৫-২৫	৭৫ (৩০)
২৫-৩৫	৪৬ (১৮)
৩৫-৪৫	২৬ (১০)
৪৫-৫৫	১৭ (৭)
৫৫+	১৮ (৭)

প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানের জন্য নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার করে অনুসন্ধানী দল ১৪ অক্টোবর পাবনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৭৩ জন রোগীর মধ্যে ১৮ জনের (২৫%) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী রোগীদের মধ্যমা বয়স ছিলো ১৭ বছর এবং এই ১৮ জনের মধ্যে ১০ জন (৫৫%) ছিলো মহিলা। হাসপাতালে সাক্ষাৎ প্রদানকারী সব রোগীর ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে পানির মতো পাতলা পায়খানা শুরু হওয়া এবং পানিশূন্যতা দেখা দেওয়া ও দুর্বলতার ইতিহাস ছিলো। সেই সাথে বেশিরভাগ রোগীর বমি হয় বলেও তারা জানায়। এই ১৮ জন রোগী ভর্তি হওয়ার সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ডায়রিয়া চিকিৎসার নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের

১২ জনের (৬৭%) মধ্যে হালকা পানিশূন্যতা এবং চার জনের (২২%) মধ্যে মারাত্মক পানিশূন্যতা সনাক্ত করেন। এই ১৮ জন রোগীর মধ্যে আট জনের (৪৪%) পরিবারে অন্তত একজন করে ব্যক্তি ১ অক্টোবর বা তারপর একই ধরনের উপসর্গজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলো। সব রোগীই অগভীর নলকূপের পানি পান করে বলে জানায়। চারজন অবশ্য গোসল করা এবং বাসন-কোসন ও কাপড় ধোওয়ার জন্য মাঝেমধ্যে ট্যাপ এবং পুকুরের পানি ব্যবহার করার কথাও জানায়। পানি ফুটিয়ে পান করার কথা কেউই বলে নি। হাসপাতালে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১৬ জনের কাছ থেকে অনুসন্ধানী দল ব্যাক্টেরিয়াল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ায় করে রেকটাল সোয়াব সংগ্রহ করে।

হাসপাতালের রেকর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধানী দলটি এমন কয়েকটি এলাকা পরিদর্শণ করে যেসব স্থানে প্রাদুর্ভাবের সময় একসংগে অনেক রোগী ছিলো। দলের সদস্যরা পাবনা সদর উপজেলার ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্প-আয়ের একটি এলাকা, দোগাছি ইউনিয়ন এবং পাবনা পৌরসভার তিনটি এলাকা যথা- রামচন্দ্রপুর, দক্ষিণ রাঘবপুর এবং শালগারিয়ায় ২০টি খানা পরিদর্শণ করেন। ওইসব খানাসমূহের মধ্য থেকে তাঁরা পাবনা জেলা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে আরোগ্যলাভকারী ১২ জনের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, তাদের কাছ থেকে রোগের সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়ের জন্য। প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়ে পাবনা জেলা হাসপাতালে মারা যাওয়া একজন রোগীর বাড়িও তাঁরা পরিদর্শণ করেন। তাঁরা খানাসমূহের পানীয় পানির উৎস সম্পর্কে জানতে চান এবং সেখানকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এই ১২ জন রোগীর সবাই এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা জানায় যে, তারা অগভীর নলকূপের পানি পান করে এবং গোসল করা ও কাপড় এবং বাসন-কোসন ধোয়ার জন্য ট্যাপ অথবা পুকুরের পানি ব্যবহার করে। অনুসন্ধানী দলের সদস্যরা বেশিরভাগ খানার নলকূপ পায়খানার খুব কাছাকাছি দেখতে পান। তাঁরা দোগাছি ইউনিয়নের মৃত ব্যক্তির খানায় ব্যবহৃত নলকূপ এবং পুকুরের পানির নমুনা এবং পাবনা সদর উপজেলার ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্প-আয়ের এলাকার দুটি নলকূপের পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। পাবনা পৌরসভার শালগারিয়া এলাকার একটি খানা থেকেও তাঁরা ট্যাপের পানির একটি নমুনা সংগ্রহ করেন।

পাবনা পৌরসভার পানি সরবরাহ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধানী দলটি পৌরসভার মেয়র এবং প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা জানান যে, সমগ্র পৌরসভায় মোট ১০টি গভীর নলকূপ আছে এবং সেগুলোর মাধ্যমে পানি তুলে পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে তা খানাসমূহে সরবরাহ করা হয়। অনুসন্ধানী দলটি শিবরামপুরে অবস্থিত একটি গভীর নলকূপ এলাকা পরিদর্শণ করে যেখান থেকে শালগারিয়া এবং রাঘবপুরে পানি সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, এদুটি এলাকায় প্রাদুর্ভাবের সময় সবচেয়ে বেশি রোগী ছিলো। শিবরামপুর নলকূপ এলাকা তাঁরা নিরাপদ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখতে পান। তাছাড়া পাইপে কোনো ধরনের ছিদ্রও পরিলক্ষিত হয় নি। তাঁরা মাটির ওপরে পানির একটি ধারক দেখতে পান যা এখন ব্যবহার করা হয় না।

পাবনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রেকটাল সোয়াব আইইডিসিআর-এর মাইক্রোবায়োলোজি গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। ষোলটি নমুনার মধ্যে আটটি থেকে (৫০%) *ভিবরিও কলেরি* সনাক্ত করা হয়। *ভিবরিও কলেরি*-র এই আটটি নমুনার মধ্যে সাতটি (৮৮%) ছিলো *ভিবরিও কলেরি* ওগাওয়া এবং একটি (১২%) ছিলো নন-ওগাওয়া নন-ইনাবা প্রজাতির। সংবেদনশীলতা পরীক্ষায় সবগুলো নমুনার ক্ষেত্রেই টেট্রাসাইক্লিন, নাইট্রোফুরানটোইন, ডক্সিসাইক্লিন, ইরিথ্রোমাইসিন এবং অ্যাম্পিসিলিন অকার্যকর দেখা গেছে। তবে সবগুলো নমুনাই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, সেফট্রিআক্সোন এবং সেফুরোক্সিমের প্রতি সংবেদনশীল ছিলো।

আইইডিসিআর-এর মাইক্রোবায়োলোজি গবেষণাগারে পরীক্ষিত পাবনা পৌরসভা থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির নমুনাসহ পাঁচটি পানির নমুনার সবগুলো থেকেই কলিফর্ম সনাক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ এন্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রোগীর অবস্থা এবং গবেষণাগারের পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, পাবনা পৌরসভা এবং সদর উপজেলায় এটি ছিলো কলেরা রোগের একটি প্রাদুর্ভাব। বাংলাদেশে ডায়রিয়া রোগের তিনটি প্রধান জীবাণুর মধ্যে *ভিবরিও কলেরি* একটি (৪)। অনিরাপদ পানি পান করা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ঘনবসতির সাথে কলেরা মহামারির একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে (৫)।

ভারী বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ করে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই পাবনা পৌরসভা এবং সদর উপজেলায় তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এবং প্রাদুর্ভাব-কবলিত এলাকায় ট্যাপ ও নলকূপের পানিতে কলিফর্ম পাওয়া থেকে বোঝা যায় যে, প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণটি ছিলো দূষিত পানি। যেসব পৌর এলাকায় ক্লোরিন দ্বারা পানি বিশুদ্ধ না করেই তা পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়, সেসব স্থানে অতীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিলো বলে তথ্য পাওয়া গেছে (৬)। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী রোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের পৌরসভার ট্যাপের পানি ব্যবহারের সুযোগ আছে। যদিও তারা তা পান করার কথা জানায় নি, তবে তা বাসার বিভিন্ন ধরনের কাজে এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের কথা জানিয়েছে। অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে মনে হয় যে, পাবনা পৌরসভা কর্তৃক পাইপলাইনে সরবরাহকৃত পানির মাধ্যমে *ভিবরিও কলেরি* ছড়িয়ে থাকতে পারে।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা বর্তমান যে, নলকূপের পানি নিরাপদ এবং দূষিত হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। অথচ সংগৃহীত পাঁচটি নমুনার মধ্যে তিনটি চাপকলের পানির নমুনার সবগুলোই কলিফর্ম দ্বারা দূষিত ছিলো। ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া থেকে বোঝা যায় যে (২২ সেপ্টেম্বর রেকর্ডকৃত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিলো ৭৯ মিলিমিটার), এ-বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির উপরিভাগের দূষিত পানি নলকূপে ঢুকে থাকতে পারে।

এই প্রাদুর্ভাবের সময় পাবনা পৌরসভা এবং সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একসংগে অনেক রোগী আক্রান্ত হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১৮ জন রোগীর মধ্যে আটজন (৪৪%) জানায় যে, বিগত ১৫ দিনে তাদের পরিবারে কমপক্ষে আরো একজনের ডায়রিয়ার উপসর্গ ছিলো। সব রোগীই নলকূপের পানি পান করার কথা জানায় এবং কেউই পানি ফুটিয়ে পান করার কথা জানায় নি। এ-থেকে বোঝা যায় যে, এ-ধরনের প্রাদুর্ভাবের সময় কমিউনিটিতে রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব ছিলো।

যেসব কমিউনিটির মানুষ পানের জন্য পাইপলাইনে সরবরাহকৃত অপরিশোধিত পানি অথবা অগভীর বা গভীর নলকূপের পানির ওপর নির্ভরশীল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেসব কমিউনিটিতে (যেমন, যেসব

এলাকায় কলেরার এই প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়েছে) আন্ত্রিক সংক্রমণজনিত প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার জন্য ক্লোরিনের মাধ্যমে অথবা ফুটিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে পান করার পরামর্শ দেয় (৭)। অতএব এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব যাতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে কমিউনিটিতে নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এ-লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে গৃহীত একটি ব্যবস্থা হিসেবে ক্লোরিনের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য আক্রান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা অথবা সবাইকে পানি ফুটিয়ে পান করা-সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানো উচিত। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের লক্ষ্যে পৌরসভা পর্যায়ে ক্লোরিন প্রয়োগের মাধ্যমে পানির মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল মান নিশ্চিত করে তা সরবরাহ করা উচিত।

References

1. World Health Organization. Mortality country fact sheet 2006. Geneva: World Health Organization, 2006. (http://www.who.int/whosis/mort/profiles/mort_searo_bgd_bangladesh.pdf, accessed on 28 February 2010)

2. Bangladesh. Directorate General of Health Services, Health bulletin 2009. Dhaka: Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh. 2009. (http://www.dghs.gov.bd/App_Pages/Client/File_Upload_Show.aspx?val=1, accessed on 28 February 2010)

3. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh Demographic and Health Survey 2007. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2007. 136 p.

4. ICDDR,B. Trends in aetiologies for diarrhoeal diseases. *Health Sci Bul* 2002;1:12-5.

5. Heymann DL editor. Control of communicable diseases manual. 18 edition. Washington DC: American Public Health Association, 2004. p. 104.

6. Sur D, Sarkar BL, Manna B,Deen J,Datta S,Niyogi SK *et al*. Epidemiological, microbiological and electron microscopic study of a cholera outbreak in a Kolkata slum community. *Indian J Med Res* 2006;123;31-6.

7. World Health Organization. Guidelines for drinking water quality: volume 3; Surveillance and control of community supplies. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 1997. 238 p.

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর সময় ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে ঢাকার মিরপুরের অধিবাসীদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ: খানা পর্যায়ে অসুস্থতা-সংক্রান্ত ব্যয়ের ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষা

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের একটি এলাকার ৫৮টি খানায় অসুস্থতা-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক চাপ বের করার জন্য আইসিডিডিআর,বি একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এতে দেখা যায় যে, একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার চিকিৎসায় প্রত্যক্ষ মধ্যমা খরচ ছিলো ২১০ টাকা (তিন মার্কিন ডলার) এবং পরোক্ষ মধ্যমা খরচ ছিলো ১৩৪ টাকা (দু ডলার)। দিনমজুর রোগীদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ ছিলো সবচেয়ে বেশি, যা বোঝা যায় অসুস্থতার ফলে তাদের মাসিক খরচ দেখে। এ-সংক্রান্ত খরচের পরিমাণ ছিলো তাদের মাসিক ব্যয়ের ৩৫%।

স্বল্প-আয়ের দেশসমূহে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যাসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (১)। বাংলাদেশের শিশুদের মৃত্যু এবং অসুস্থতার প্রধান কারণ এটি (২)। বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলে মতলব নামক স্থানে দুবছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে পরিচালিত একটি এলাকাভিত্তিক কোহর্ট গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেখানে ওইসব শিশুদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণের হার প্রতি বছর প্রতি ১০০ শিশুর মধ্যে ৩০ বার (৩)। শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশে সংক্রমণজনিত অসুস্থতার ফলে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হার ছিলো বছরে প্রতি ১,০০০ জনে ৫০ জন (৪)। পাঁচ বছরের কম-বয়সী মৃত শিশুদের ২৫% এবং এক বছরের কম-বয়সী মৃত শিশুদের ৪০% মারা যায় শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশে সংক্রমণজনিত অসুস্থতার ফলে (৫)। অন্যান্য বয়সশ্রেণীতেও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ খুব সাধারণ একটি সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ, আইসিডিডিআর,বি-র একটি গবেষণায় দুমাসে সব বয়সশ্রেণীর ২১% মানুষকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত দেখা যায় (৬)। বাংলাদেশে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য যদিও আমাদের কাছে আছে, তবে এ-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক চাপ সম্পর্কে খুব কমই জানা আছে। শ্বাসতন্ত্রের সাধারণ সংক্রমণজনিত সমস্যার ফলে খানাসমূহের কী পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় আলোচ্য নিবন্ধে তার একটি সম্ভাব্য হিসাব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ব্যাপারে খানাসমূহের সদস্যদের আচরণগত দিকগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।

ঢাকার মিরপুরে, যেখানে একটি মিশ্রআয়ের লোকজনের বসবাস, সেখান থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৩৮টি স্থান (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) নির্বাচন করা হয় (চিত্র ১) এবং এসব স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। এরপর প্রত্যেকটি স্থানের সবচেয়ে কাছের খানাটি নির্বাচন করা হয় অথবা দৈবচয়নের ভিত্তিতে তৈরি তালিকা থেকে কিছু খানা পরিবেষ্ঠিত একটি স্থান নির্ধারণ করা হয় (যেমন - অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংস)। খানাসমূহের মধ্য থেকে বিগত দুমাসে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী নির্বাচনের জন্য মাঠ গবেষণা সহকারীগণ (এফআরএ) খানাসমূহের বয়স্ক প্রতিনিধিদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে তাঁদের সম্মতি নিয়ে মানসম্মত প্রশ্নাবলির মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষণা সহকারীগণ খানাসমূহের মাসিক গড় খরচ (খানাসমূহের আয়ের বিকল্প) এবং খানাসমূহের সদস্যদের কেউ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে থাকলে তার বা তাদের চিকিৎসার খরচের হিসাব উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এরপর ডাক্তারের ফি, ওষুধের মূল্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

যাতায়াত খরচ যোগ করে চিকিৎসার প্রত্যক্ষ খরচ বের করা হয়। রোগী এবং সেবাদানকারীদের নষ্ট হওয়া (অসুস্থতার জন্য কাজ করতে না পারা) দিনগুলোর সাথে তাদের প্রতিদিনের মজুরি গুণ করে চিকিৎসার পরোক্ষ হিসাবও বের করা হয়। বিদ্যালয়-পড়ুয়া শিশুদের ক্ষেত্রে অসুস্থতার জন্য তারা যে কদিন স্কুলে যেতে পারে নি তা হিসাব করা হয়।

চিত্র ১: ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার খরচ নির্ণয়ে পরিচালিত সমীক্ষা এলাকার খানাসমূহের অবস্থান, মিরপুর ১০, ঢাকা, ২০০৯। বৃত্তের মধ্যে খানাসমূহের পরিচিতি নম্বরসহ অবস্থান দেখানো হয়েছে।

সমীক্ষার তিন-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা ছিলো গৃহকর্ত্রী (১০২/১৩৮ জন) (সারণি ১)। সব উত্তরদাতা মোট ৬৫৮ জন খানা সদস্যের তথ্য দিয়েছেন (পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৯ জন)। খানা সদস্যদের মধ্যমা (মিডিয়ান) বয়স ছিলো ২২ বছর (ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ১২-৩৫ বছর)। খানা প্রতি তাদের মাসিক মধ্যমা ব্যয় ছিলো ১০,০০০ টাকা (১৪৫ মার্কিন ডলার) (ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ৬,০০০-১৫,০০০ টাকা)।

বিগত দুমাসে ৬৫৮ জন খানা সদস্যের মধ্যে ৬৯ জনের (১১%) ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা ছিলো। উক্ত রোগীদের মধ্যে ৫৮ জন (৮৪%) তাদের অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা নিয়েছে। অসুস্থতার জন্য রোগীরা গড়ে ১.৫ বার সেবা নিয়েছে। প্রথমবার সেবা নেওয়ার সময় ৫৮ জন রোগীর মধ্যে ২৮ জন (৪৮%) স্থানীয় ফার্মেসি থেকে, ১৫ জন (২৬%) এমবিবিএস ডাক্তার, ৭ জন (১২%) সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, এবং ৬ জন (১১%) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অথবা সনদবিহীন স্থানীয় ডাক্তারের কাছ থেকে সেবা নিয়েছে। আটান্ন জন রোগীর মধ্যে ১৪ জনের (২৪%) বয়স ছিলো পাঁচ বছরের কম এবং ২ জনের (৩%) দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা-সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো। চৌদ্দ জন শিশুরোগীর মধ্যে ১১ জন (৭৯%) সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছ থেকে, একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছ থেকে, একজন সনদবিহীন স্থানীয় ডাক্তারের কাছ থেকে এবং একজন ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা জানায় যে, (৩৭/৫৮ জন) উল্লিখিত

সেবাদানকারীদের কাছ থেকে সেবা নেওয়ার প্রধান কারণ ছিলো কম দুরত্ব।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার চিকিৎসায় মধ্যমা (মিডিয়ান) প্রত্যক্ষ খরচ ছিলো ২১০ টাকা (৩ মার্কিন ডলার) (ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ৫০-৪২৫ টাকা) (সারণি ২)। ফার্মেসি থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে গড় (মিন) প্রত্যক্ষ খরচ ছিলো সবচেয়ে কম (১৮৫ টাকা অথবা ২.৭ মার্কিন ডলার) এবং হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে এ-খরচ ছিলো সবচেয়ে বেশি (৪২৫ টাকা অথবা ছয় মার্কিন ডলার)। আটান্ন জন রোগীর মধ্যে ২৬ জন (৪৫%) সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয় (পরামর্শের জন্য মধ্যমা খরচ ছিলো ৮০ টাকা)। ওষুধের জন্য মধ্যমা খরচ ছিলো ১৬৫ টাকা (২.৪ মার্কিন ডলার) (ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ৪৬-৪০০ টাকা) যা ছিলো প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে সবচেয়ে বড় খরচ। অধিকন্তু, নয়জন রোগীকে তাদের যাতায়াত খরচ বহন করতে হয় (মধ্যমা খরচ ছিলো ৪০ টাকা অথবা ০.৬ মার্কিন ডলার)। আটান্ন জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন (২৫%) অসুস্থতার সময় রোগীদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য কিনে (যেমন - ফল, দুধ, ডিম, মাংস এবং হরলিক্স)।

সারণি ১: ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার খরচ নির্ণয়-সংক্রান্ত সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, মিরপুর ১০, ঢাকা, ২০০৯

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সংখ্যা (অনুপাত)
জনগণের বয়স	
< ৪ বছর	৬৬ (১০%)
৫-১৭ বছর	১৯৩ (২৯%)
১৮-৪৯ বছর	৩২২ (৪৯%)
>৫০ বছর	৭৫ (১২%)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	
১-৪ জন	৬১ (৪৫%)
>৪ জন	৭৪ (৫৫%)
উত্তরদাতাদের পেশা	
গৃহবধু	১০২ (৭৪%)
চাকরি	১৯ (১৪%)
ব্যবসা	১৪ (১০%)
অন্যান্য	৩ (২%)
খানাসমূহের গড় মাসিক খরচ	
<৬,০০০ টাকা	৩৭ (২৮.৫%)
৬,০০১-৮০০০ টাকা	২১ (১৬.২%)
৮,০০১-১০,০০০ টাকা	২৩ (১৭.৭%)
১০,০০১-২০০০০ টাকা	৩৭ (২৮.৫)
২০,০০১-৩০,০০০ টাকা	১০ (৭.৬%)
>৩০,০০০ টাকা	২ (১.৫%)

রোগীদের মধ্যমা পরোক্ষ খরচ ছিলো ১৩৪ টাকা (দুই মার্কিন ডলার) (সারণি ২) এবং এটি ছিলো তাদের মোট খরচের ৫১%। অন্যান্য পেশার রোগীদের তুলনায় (মধ্যমা খরচ ৫৬৭ টাকা অথবা ৮.২ মার্কিন ডলার [ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ২৮৫-৯৭৭ টাকা]) দিনমজুরদের (যেমন - রিক্সাচালক এবং শ্রমিক) পরোক্ষ খরচ ছিলো বেশি (মধ্যমা খরচ ১,৩৫৭ টাকা অথবা ২০ মার্কিন ডলার [ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ১,২৪০-১,৯০২ টাকা])। আটান্ন জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ২০ জনের (৩৪.৫%) যে সময় নষ্ট হয় তার মধ্যমা রেঞ্জ ছিলো ৪.৫ দিন (ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ: ২.৫-৫.৫ দিন)। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে কাজে যেতে না পারায় খানা প্রতি মধ্যমা পরোক্ষ খরচ ছিলো ৯১৩ টাকা (১৩.২ মার্কিন ডলার)। বেতনভিত্তিক কর্মচারীদের (গড়ে ৩ দিন) (পি ভ্যালু=.০৩) তুলনায় দিনভিত্তিক আয়ের সাথে জড়িত রোগীদের কর্মদিবস নষ্ট হয় বেশি (মধ্যমা ৫ দিন)। একজন

রোগী গড়ে ২.৯ দিন অসুস্থ অবস্থায় কাজ করেছে (এবং এভাবে ২০ জন কাজ করেছে মোট ৫৯ দিন)। আটান্ন জনের মধ্যে নয় জন শুশ্রূষাকারী (১৫%) মধ্যমা ২.২ দিন কাজ করতে পারে নি কারণ তারা রোগীদের সেবাদানে নিয়োজিত ছিলো। আটান্ন জন রোগীর মধ্যে ৯ জন (১৫%) ছিলো গৃহবধু যারা অসুস্থতার সময় গড়ে ৪.৬ দিন কাজ করেছেন।

সারণি ২: ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার জন্য বিভিন্ন ধরনের খরচ, মিরপুর ১০, ঢাকা, ২০০৯

খরচসমূহ	মধ্যমা খরচ টাকা (মার্কিন ডলার)	ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ টাকা (মার্কিন ডলার)
প্রত্যক্ষ খরচ	২১০ (৩)	৫০-৪২৫ (.৭-৬.১)
ফার্মেসি (২৮)	১০৩ (১.৫)	৩৭-২৮৭ (.৫৩-৪.১)
এমবিবিএস ডাক্তার (১৪)	৩৯০ (৫.৬)	২৪৭-৬২০ (৩.৫-৯)
হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিদর্শন (৭)	৩১৮ (৪.৬)	২৯০-৬০০ (৪.২-৮.৬)
হোমিওপ্যাথি এবং সনদবিহীন ডাক্তার (৬)	১২৫ (১.৮)	৫৭-৪৫০ (.৮-৬.৫)
প্রত্যক্ষ খরচের বিষয়সমূহ		
ওষুধ বাবদ খরচ (৫৬)	১৬৫ (২.৯)	৪৬-৪০০ (.৬৭-৫.৮)
চিকিৎসকের পরামর্শ বাবদ খরচ (১৯)	৮০ (১.১)	৩৫-১০০ (.৫-১.৪)
যাতায়তের জন্য খরচ (৯)	৪০ (.৬)	৩০-৮০ (.৪-১.১)
পরোক্ষ খরচ	১৩৪ (১.৯)	৮৫-৫১৩ (১.২-৭.৪)
দিনমজুর (৬)	১,৩৫৭ (১৯.৭)	১,২৪০-১,৯০২ (১৮-২৭.৬)
ব্যবসায়ী এবং চাকরি (১৪)	৫৬৭ (৮.২)	২৮৫-৯৭৭ (৪.১১-৪.২)
বিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্র (১৪)	১০২ (১.৫)	৪২-১৩১ (.৬-১.৯)
গৃহবধু (৯)	৮৫ (১.২)	৬৮-২৯৪ (১-৪.৩)
পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু (১৪)	১১০ (১.৬)	৫১-১৩৬ (.৭- ২)
মোট খরচ	৪২৮ (৬.২)	১৬৯-১,০৫৮ (২.৪-১৫.৩)
দিনমজুর (৬)	১,৭৬২ (২৫.৫)	১,৬৫২-২,৩৯৯ (২৩.৯-৩৪.৮)
ব্যবসায়ী এবং চাকরি (১৪)	৯১৩ (১৩.২)	৪০২-১,২২৭ (৫.৮-১৭.৮)
বিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্র (১৪)	১৬৯ (২.৪)	১০১-২৫৮ (১.৫-৩.৭)
গৃহবধু (৯)	৪০০ (৫.৮)	২৩৫-৯০৯ (৩.৪-১৩.২)
পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু (১৪)	৪৪৪ (৬.৪)	১৩০-৭০৬ (১.৯-৭৮.৪)

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত ৫৮ জন রোগীর মধ্যে ১৫ জন (২৬%) ছিলো শিশু যারা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলো। অসুস্থতার জন্য এদের ১১ জনের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার মধ্যমা সময় ছিলো ৫.৩ দিন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় একবার আক্রান্ত হওয়ার মধ্যমা মোট খরচ ছিলো ৪২৮ টাকা (৬.২ মার্কিন ডলার)। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত সব রোগীর খানার চিকিৎসার খরচ ছিলো তাদের মোট মাসিক খরচের ৯.৪% (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, ৫.৮-১৩)। তবে, দিনমজুর

রোগীদেরকে তাদের মাসিক খরচের ৩৫% (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, ১৪-৫৬) চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে খানাসমূহের ওপর পড়া প্রভাব সম্পর্কে জানার জন্যে যে ৪৯ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে ৩৭ জন (৭৫%) জানায় যে, এ-অসুস্থতার ফলে তাদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তা তাদের জন্য একটি বোঝাস্বরূপ। তাদের মতে এই অর্থনৈতিক বোঝা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি সাধারণ কৌশল ছিলো: সঞ্চয়কৃত টাকা খরচ করা (৪১%), প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঋণ করা (২০%), এবং পারিবারিক অন্যান্য খরচ কমিয়ে ফেলা (১৪%)।

প্রতিবেদন: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এবং ব্রাক ইউনিভার্সিটি

মন্তব্য

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা যদিও অনেক সময় এমনিতেই ঠিক হয়ে যায় এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, তথাপি এ-ধরনের সাধারণ অসুস্থতার খরচ ঢাকার মিরপুরের অধিবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের কোনো স্বাস্থ্য বীমা না থাকায় তাদের সব ধরনের প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছে তাদের পকেট থেকে। শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং মিরপুর ২-এ অবস্থিত একটি শিশু হাসপাতালে কম খরচে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করার সুবিধা ছিলো, কিন্তু গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণ সেখানে খুব কমই গিয়েছে। তাছাড়া এসব স্থানে যাতায়াত খরচ এবং সময় (সুবিধা খরচ) বেশি লাগে। অসুস্থতায় আক্রান্ত ৪৯টি খানার মধ্যে ৩০টি খানা (৬১%) তাদের জমানো টাকা থেকে বা ধার করে অসুস্থতার খরচ মিটিয়েছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর কারণে হয়, যার খরচ মিরপুরের মতো এলাকাবাসীদের জন্য একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক বোঝাস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, মিরপুর সার্ভিলেন্স উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে (গবেষণা চলাকালীন সময়ে) শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত ৬৭ জন শিশুর মধ্যে ২০ জন (৩০%) রিনোভাইরাসে; ১৪ জন (২১%) ভাইরাল কো-ইনফেকশনে; পাঁচজন (৭%) এডিনোভাইরাসে; পাঁচজন (৭%) প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ ২-এ; চারজন (৬%) হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাসে; চারজন (৬%) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে এবং দুজন (৩%) ছিলো শ্বাসতন্ত্রের সিনসিটিয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত। এছাড়া ৬৭ জন শিশুর ১৩ জনের (১৯%) মধ্যে কোনো রোগ-জীবাণু পাওয়া যায় নি, যা থেকে বোঝা যায় যে, রোগ সৃষ্টি করার মতো আরো ভাইরাস বা জীবাণু ছিলো যেগুলো সার্ভিলেন্স পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় নি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে অর্থনৈতিক চাপের জন্য শ্বাসতন্ত্রের প্রত্যেকটি জীবাণুই দায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের একটি অংশ এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এও আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে, কারণ গবেষণাটি পরিচালিত হয় ওই মহামারী সংঘটিত হওয়ার সময়। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত রোগীর হারের সাথে (বছরে ১১%) ঢাকার জনসংখ্যা (১০,৮৯৬,২৯৬ জন), মিরপুরের খরচ এবং স্বাস্থ্সেবা গ্রহণের হার গুণ করে অনুমান করা যায় যে, এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ ঢাকা শহরের মানুষের

মোট খরচ হয়েছিলো প্রায় ৪২ কোটি টাকা।

আলোচ্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ রোগীই প্রথমে এলাকার ওষুধের দোকান থেকে চিকিৎসা নেওয়ার কথা জানায়, কারণ সেগুলো ছিলো তাদের কাছাকাছি। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের চিকিৎসায় অনেক রোগী অ্যান্টিহিস্টামিন, এসিটামিনোফেন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ নেওয়ার কথাও জানায়। তাদের কেউই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে এমন কোনো ওষুধ নেয় নি। মিরপুরের রোগীদের নেওয়া ওষুধের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ছিলো সবচেয়ে দামী। প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসায় জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত জটিলতা ঠেকানো সম্ভব, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। তবে প্রয়োজন বিবেচনা না করে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার খরচের বোঝা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং বাংলাদেশে এর কার্যকারিতাও নষ্ট করে দিতে পারে।

এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। গবেষণায় নমুনার পরিমাণ ছিলো কম এবং সেবার জন্য অর্থ খরচ করার বিষয়টি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ভৌগলিক অবস্থানভিত্তিক নমুনা সংগ্রহের ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী খানা নির্বচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বলে খরচের পরিমাণও বেশি হয়ে থাকতে পারে। মিরপুরের উপাত্ত নানা শ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসম্বলিত মিরপুরের মতো অন্যকোনো স্থানের জন্য প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জন্য এটি উদাহরণ হিসেবে কাজ নাও করতে পারে।

এ-গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং অসুস্থ মানুষ তাদের চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে ইচ্ছুক। এখান থেকে জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এসেছে। প্রথমত, কম খরচে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা প্রতিরোধের জন্য (তা যে ধরনেরই জীবাণু দ্বারা হোক না কেন) আরো কর্মসূচি সংযোজন করা প্রয়োজন। যেমন, শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটানোর মতো জীবাণুর বিস্তৃতি রোধকল্পে ওইসব কর্মসূচির মধ্যে হাতধোয়া, শ্বাসতন্ত্র পরিষ্কার রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব (সোশাল ডিস্টান্সিং) বজায় রাখা-সংক্রান্ত জনসচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত (৭)। দ্বিতীয়ত, জনগণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে আগ্রহী হলে বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতির পর্যালোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণনির্ভর ব্যবস্থাপনা-নির্দেশিকা তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় ফার্মেসি যদি জনগণের সেবা নেওয়ার একটি অন্যতম উৎস হয়ে থাকে, তাহলে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিভাইরাল দেওয়ার জন্য রোগের লক্ষণভিত্তিক অ্যালগোরিদম ব্যবহার করার ওপর বাংলাদেশ সরকার ফার্মেসির কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের করতে পারে। এ-ধরনের কৌশল সেবার মান উন্নয়নে, খানাসমূহের অর্থনৈতিক বোঝা কমাতে এবং হাসপাতালসমূহের অতিরিক্ত বোঝা কমানোর জন্য সহায়ক হতে পারে।

Reference

1. Black RE, Morris SS, Bryce J. Where and why are 10 million children dying every year? *Lancet* 2003;361:2226-34.
2. National Institution of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 2007. Dhaka: National Institution of Population Research and Training, 2007. 346 p.

3. Zaman K, Baqui AH, Yunus M, Sack RB, Bateman OM, Chowdhury HR, *et al*. Acute respiratory infections in children: a community-based longitudinal study in rural Bangladesh. *J Trop Pediatr* 1997;43:133-7.

4. Baqui AH, Rahman M, Zaman K, El Arifeen S, Chowdhury HR, Begum N, *et al*. A population-based study of hospital admission incidence rate and bacterial aetiology of acute lower respiratory infections in children aged less than five years in Bangladesh. *J Health Popul Nutr* 2007;25:179-88.

5. Baqui AH, Black RE, Arifeen SE, Hill K, Mitra SN, al Sabir A. Causes of childhood deaths in Bangladesh: results of a nationwide verbal autopsy study. *Bull World Health Organ* 1998;76:161-71.

6. Baumgartner EA, Rahman M, Homaira N, Zaman R, Dee J, Gurley E, *et al*. Incidence of influenza in hospital-based surveillance, Bangladesh-2008 and 2009. (unpublished)

7. ICDDR B. Pandemic (H1N1) 2009 in Bangladesh. *Health Sci Bul*. 2009;7:1-8.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৯-ফেব্রুয়ারি ২০১০

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৭৫)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=৬১১)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩১.১	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৬২.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫২.০	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪০.০	০.৩
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৬.০	৯৯.৮
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২০.৯
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৯-ফেব্রুয়ারি ২০১০

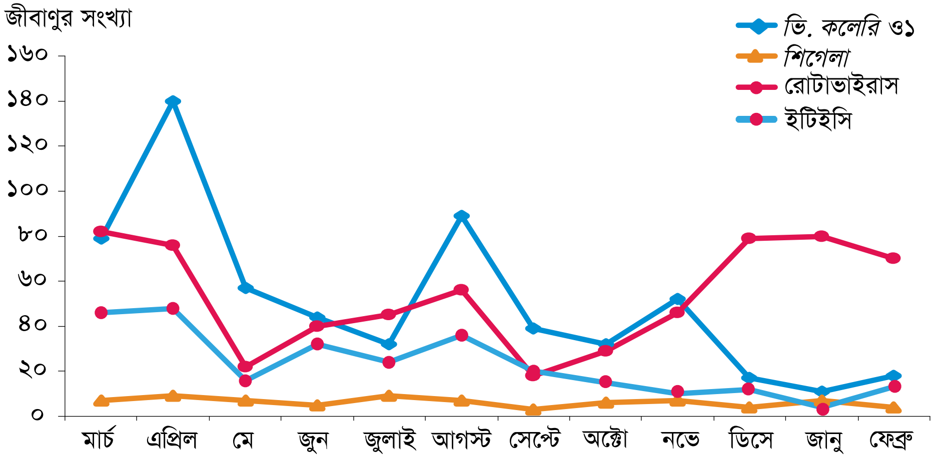

ওষুধের বিরুদ্ধে ৮৪ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: মার্চ ২০০৯-ফেব্রুয়ারি ২০১০

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাথমিক সংখ্যা=৭১ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১৩ (%)	সংখ্যা=৮৪ (%)
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৬ (২২.৫)	১ (৭.৭)	১৭ (২০.২)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১০ (১৪.১)	২ (১৫.৪)	১২ (১৪.৩)
ইথামবিউটাল	১ (১.৪)	১ (৭.৭)	২ (২.৪)
রিফামপিসিন	১ (১.৪)	০ (০.০)	১ (১.২)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	১ (১.৪)	০ (০.০)	১ (১.২)
অন্যান্য ওষুধ	১৭ (২৩.৯)	২ (১৫.৪)	১৯ (২২.৬)

( ) শতকরা হার *একমাস বার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১০**

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
ক্লোরামফেনিকল	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
অক্সাসিলিন	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

* উল্লিখিত সময়ে কোনো *স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনির* জীবাণু পাওয়া যায় নি

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১০*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১৭	৮ (৪৭.০)	০ (০.০)	৯ (৫৩.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১৭	১০ (৫৯.০)	০ (০.০)	৭ (৪১.০)
ক্লোরামফেনিকল	১৭	১০ (৫৯.০)	০ (০.০)	৭ (৪১.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	১৭	১৭ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১৭	০ (০.০)	১৭ (১০০.০)	০ (০.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	১৭	০ (০.০)	০ (০.০)	১৭ (১০০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি–র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: মে ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০১০

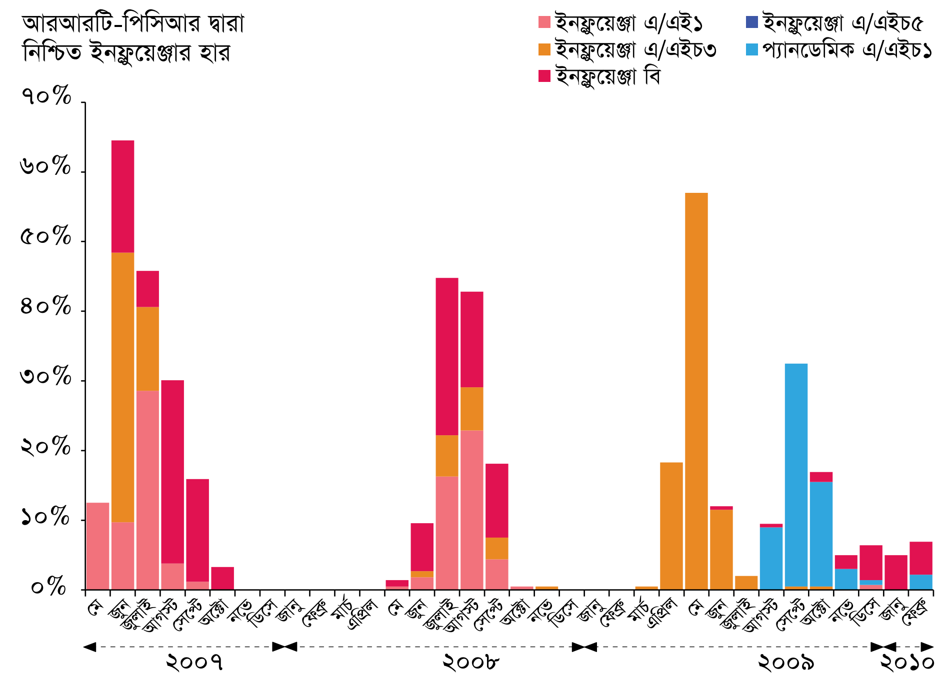

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

একজন মাঠকর্মী সেবাগ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন

আইসিডিডিআ,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), রাজকীয় নেদারল্যান্ডস-এর দূতাবাস (ইকেএন), এবং সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা)। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডরথি সাউদার্ন
এডোয়ার্ডো আজিজ বামগার্টনার

অতিথি সম্পাদক:
মেগানা গাডগিল
কামরুন নাহার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ: রুখসানা গাজী
২য় নিবন্ধ: অপূর্ব চক্রবর্ত্তী
৩য় নিবন্ধ: আবু মো: নাসির টিটু

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
ডাইনামিক প্রিন্টার্স